সম্রাটের হৃদয়

চিত্তরঞ্জন মাইতি

তখন গ্রামের স্কুলে পড়ি। ছোটবেলা থেকেই লেখাজোখার অভ্যেস ছিল। আমি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন 'ভাইবোন' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। মা সে-গল্প পড়ে কলকাতার কোনও ছোটদের পত্রিকায় পাঠানোর জন্য আমাকে উৎসাহ দেন।

আমি এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি শিশু মাসিকের ঠিকানা জোগাড় করে গল্পটি পাঠিয়ে দিলাম। মাস তিনেক কোনও সাড়াশব্দ নেই। ইতিমধ্যে নবম শ্রেণিতে উঠেছি। হঠাৎ আমার বন্ধুটি ওই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে এসে বলল, ''দ্যাখ তোর নাম বেরিয়েছে।'' আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে পাতার ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম।

না, আমার লেখা বেরোয়নি। যেসব লেখা মনোনীত হয়েছে এবং কোনও একসময় বেরোবে তার একটি তালিকা দেওয়া আছে। আমার মনোনীত গল্পটির নামও রয়েছে সেখানে। ছাপার অক্ষরে নিজের ওইটুকু নাম দেখে আমার

প্রয়াত স্বনামধন্য লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবনপরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলির মাধ্যমেই তুলে ধরেছেন সনাতন ভারতের মর্মসংগীত—প্রবল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে-যাওয়া সমাজের সামনে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে অশীতিপর সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শী রচনায়।

আনন্দের অন্ত ছিল না। প্রতি মাসে বন্ধুর পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিতাম, প্রতিবারেই নিরাশ হতে হত।

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে আমার হতাশা আর ব্যথার কথা জানিয়ে সম্পাদক মশাইকে প্রায় দশ-বারোখানা চিঠি পাঠিয়েছি। শেষের চিঠির একটি লাইন ছিল—''আমরা গ্রামের ছেলে বলে কি আপনারা আমাদের উপেক্ষা করছেন?''

পরে পড়তে এলাম কলকাতায়। ভর্তি হলাম কলেজে। একদিন ওই পত্রিকা অফিসের ঠিকানা খোঁজ করে গিয়ে দাঁড়ালাম পাঁচতলা একটা বাড়ির সামনে, উলটোদিকের ফুটপাথে। দেখলাম প্রতিষ্ঠানের একটি নাম দেওয়া আছে। সেখান থেকে ছোটদের নানারকমের বই প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকাটির নামও বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে। বুঝলাম নিচের তলায় বইয়ের দোকান। তখনও দোকান খোলেনি। কেবল ওপরে ঢোকার দরজাটা খোলা আছে।

দরজার সামনের ফুটপাথ জুড়ে একটি দৃশ্য দেখলাম। একটা উঁচু টুলের ওপর বসে আছে এক বুড়ো দারোয়ান। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সম্ভ্রান্ত একজন প্রৌঢ়। পরনে একটি খাটো ধুতি। গায়ে সাদা গলাবন্ধ একটি মেরজাই। মানুষটি নিস্পৃহ, নির্বাক। বাঁহাতে ধরে আছেন একটি থলে। একদল ভিখিরি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা এক-একজন করে নিঃশব্দে ওই প্রৌঢ় মানুষটিকে পেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি থলে থেকে এক-একটি মুদ্রা বের করে ভিখিরিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর দানপর্ব শেষ হলে তিনি নিঃশব্দে ওই দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি দারোয়ানজীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''পত্রিকা অফিস কখন খুলবে?'' বলল, ''দশটায়।'' তখন প্রায় নটা। আবার কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, ''এই ভদ্রলোকটি কে?'' দারোয়ানজী সসম্ভ্রমে বলল, ''উনিই এই বাড়ি আর দোকানের মালিক।'' নিজের থেকে আরও একটু যোগ করে বলল, ''দুঃখী মানুষদের ওপর কত্তার বড় দয়া। সকালে পায়ে হেঁটে যান গঙ্গাস্নানে। আমি ওঁর সঙ্গে যাই। ফিরে এসে ভিখিরিদের এক সিকি করে দান করেন।''

মানুষটির ওপরে প্রথম দিনেই আমার আকর্ষণ বেড়ে গেল।

সেদিন ফিরে এলাম। পরের দিন সাড়ে দশটায় গিয়ে দেখি, বইয়ের দোকান খুলে গেছে। মফঃস্বলের দোকান থেকে লোক এসে থলেভর্তি বই কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার দু-একখানা খুচরো বইও কিনছেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে দোকানের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলাম, ''পত্রিকার অফিস কি এইখানেই?'' তিনি বললেন, ''সামনের গেট দিয়ে দোতলায় উঠে যান, সম্পাদক ওখানেই বসেন।''

আমি দোতলায় উঠে ডানদিকের একটি ঘরে পৌঁছলাম। সকালে যাঁকে দেখেছিলাম প্রায় তাঁরই বয়সি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা একখানা মোটা বই উলটেপালটে দেখছেন।

একসময় আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। আমি নত হয়ে নমস্কার করলাম। অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ। বয়স ইত্যাদি অনুমান করে নিয়ে বললেন, ''লেখা থাকলে দিয়ে যাও।''

আমি সকাতরে বললাম, ''প্রায় বছর আড়াই আগে আমি একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম, মনোনীত হয়েছে বলে আপনারা জানিয়েও দিয়েছিলেন আপনাদের পত্রিকায়, কিন্তু....।''

কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি জানতে চাইলেন আমার নাম। নাম বলতেই উনি বললেন, ''তুমি এ-মাসের পত্রিকা পাওনি?''

''আমি দেশ থেকে কলকাতার কলেজে পড়ব বলে চলে এসেছি।''

''এ-মাসে তোমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে,

আর সেটি নিয়মমতো পাঠানো হয়েছে তোমার বাড়ির ঠিকানায়।"

ভীষণ খুশি হলাম। সম্পাদক মশাইকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম এমন সময় উলটোদিকের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ''বোসো।"

বসলাম। সম্পাদকমশাই হাঁক দিয়ে বললেন, ''ভুবন, এ-মাসের একখানা পত্রিকা দিয়ে যাও।" আমার বয়সি একটি ছেলে ভেতরের ঘর থেকে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে টেবিলের ওপর সে-মাসের পত্রিকাটি রাখল।

সম্পাদক মশাই পত্রিকাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, ''এখানে বসেই দেখো।" আমি পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলাম। উনি চেয়ার থেকে উঠে একটা আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। একসময় ফিরে এসে আমার সামনে একটা কাগজের বান্ডিল দিয়ে বললেন, ''খুলে দেখো তো।"

আমি একটুখানি খুলেই দেখলাম কতকগুলো চিঠি। আরে! এ যে আমার হাতের লেখা! আমি দুবছর ধরে সম্পাদক মশাইকে যে-কষ্টের কথা চিঠিগুলোতে জানিয়েছিলাম, সেগুলিকে উনি গুছিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এমন সহানুভূতিশীল হৃদয়বান মানুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছাড়া আমি জীবনে কাউকে দেখিনি।

ঢাকার একটি নামকরা হাইস্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। বর্তমান প্রতিষ্ঠানের মালিক ঢাকা থেকে ওঁকে পত্রিকার সম্পাদনার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন। ওঁর নাম কিন্তু সম্পাদক হিসেবে ছিল না, প্রতিষ্ঠানের কর্তাই ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক।

কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তখন আমার কষ্টের দিন চলছে। উনি পত্রিকায় একটি বিভাগ খুললেন। নাম দেওয়া হল, 'মধুকরের আসর'। আমি 'মধুকর' নামে সেই দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব পেলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেসব লেখা পাঠাত, সেগুলি সংশোধন করে কিছু কিছু প্রকাশ করা হত। সেজন্য মাসে আমি তিরিশ টাকা করে পেতাম। আমার পকেটমানি হয়ে যেত।

ভদ্রলোকের নাম বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বন্ধু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফুল্লকুমার গুহ মশাই। এম এ পাশ করার পর তাঁকে বলে উনি ওই কলেজে আমার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করে দেন।

এবার প্রতিষ্ঠানের মালিক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব, যাঁকে আমি প্রথম দিন সকালে দেখেছিলাম।

মানুষটি স্বল্পবাক, অত্যন্ত সফল এক ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সংসার রচনায় ভাগ্যের আনুকূল্য তিনি পাননি।

এরপর কর্মজীবনে যুক্ত হয়ে আমি কয়েক বছর ওখানে যেতে পারিনি। শুনতাম, ভায়েদের মধ্যে বিবাদ লেগেছে। এই বিবাদের জেরে আমার পরিচিত সম্পাদককে পত্রিকা অফিস থেকে চলে যেতে হয়। মধুকরের আসরটিও ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছিল। প্রবাদ আছে, অর্থই অনর্থের মূল। প্রতিষ্ঠানটির অর্জিত সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে ভায়ে ভায়ে মামলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

শেষে এতদিনের প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেল। ওই প্রাসাদোপম বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিল কোর্ট থেকে নিযুক্ত রিসিভার।

নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম তখন। মাঝে মাঝে পথে ঘাটে দেখা হয়ে যেত ওই প্রতিষ্ঠানের পুরানো কর্মচারীদের সঙ্গে। তাদের মুখে শুনতাম নানা বিপর্যয়ের কাহিনি।

একটি বিষবৃক্ষ যেন তার শাখাবাহু মেলে গ্রাস করে নিল সারা বাড়িটিকে। শেকড় ঢুকে গেল ইটের পাঁজরে, খসে পড়তে লাগল পলেস্তারা।

আমি তখন দুটি কলেজে সকাল-সন্ধে চাকরি করছি। ভোর পাঁচটায় বেরোই, রাত নটা-দশটায় ফিরি। অধ্যাপনা আর লেখাজোখাই ধ্যানজ্ঞান।

আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। সেদিন সকালে কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই খেয়াল হতে দেখি আমার বহুপরিচিত ভগ্নপ্রায় বাড়িটির উলটোদিকের ফুটপাথ ধরে যাচ্ছি। স্বভাবতই চোখ গিয়ে পড়ল বাড়িটির ওপর।

আশ্চর্য, সেই মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ঝুঁকে পড়েছে দেহ। গায়ে কিন্তু আগেকার সেই সাদা কোটটি, ময়লা হয়ে গেছে, তাপ্পি মারা। বাঁ হাতে আগের মতো ধরা ছিল না দানের মুদ্রাভরা কোনও থলি।

হঠাৎ পথের ওপর দিয়ে এক ভদ্রলোককে যেতে দেখলাম। সম্ভবত তিনি কোটপরা, দুর্দশাগ্রস্ত ওই মানুষটিকে চিনতেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে মানিব্যাগ খুলে একটি নোট তাঁর হাতে দিলেন। বৃদ্ধটি চোখের একবারে সামনে এনে নোটটিকে পরখ করে দেখতে লাগলেন।

ততক্ষণে দাতা দৃশ্যপট থেকে সরে গেছেন। বৃদ্ধ মানুষটি সেই নোটটি নিয়ে ফুটপাথের কোণের দিকে এগোলেন।

দীর্ঘকাল ফুটপাথের ওই কোণে একটি লোক বসে তোলা উনুনে চা তৈরি করত, পাশে একটা উঁচু চৌকির ওপর রাখত প্যাকেটে ভরা কতগুলি স্লাইসড পাঁউরুটি। রাজমিস্ত্রি আর জোগাড়েরা সকাল আটটা নাগাদ ওখানে বসে তারিয়ে তারিয়ে চা আর পাঁউরুটি ভাগ করে খেত।

দেখতে দেখতে দোকানিটিও বুড়ো আর কুঁজো হয়ে গেছে। মাথার সবকটা চুলই পেকে গেছে।

সম্ভ্রান্ত ভাগ্যহত সেই বৃদ্ধটির সম্ভবত অনেকক্ষণ খাবার জোটেনি। তিনি দোকানদারের হাতে নোটটি ধরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে স্লাইসড রুটির একটা প্যাকেট দিতে বললেন। আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। বুভুক্ষু মানুষটি প্যাকেট থেকে পাঁউরুটির একটা স্লাইস বের করে মুখের কাছে তুলে ধরতে গেলেন, ঠিক সেইসময় কোথা থেকে আট-দশজন ভিখিরি জড়ো হয়ে গেল। তারা হাঁ করে চেয়ে রইল ক্ষুধার্ত বৃদ্ধের দিকে।

চোখে ভাল করে দেখতে না পেলেও মনে হল গন্ধে বুঝেছেন, তাঁকে ঘিরে ধরেছে ভিখিরির দল।

মানুষটি একটি একটি স্লাইস রুটি বের করে তাদের হাতে তুলে দিতে লাগলেন। বৃদ্ধ চা-ওলাটি সবকিছু জানত, সে ভিখিরিগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু অসহায় সম্রাট হাত নেড়ে চা-ওলাকে ওদের তাড়াতে বারণ করলেন।

এখন স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন সম্রাট, বাঁ হাতে স্লাইসড রুটির প্যাকেট। একটি-একটি করে কখনও ভেঙে, কখনও বা আস্ত বিতরণ করছেন। সব-কটি বিলিয়ে দিতে দেরি হল না।

ভিখিরিরা হাতে পাঁউরুটির পিসগুলো নিয়ে সরে যেতেই চা-ওলা কয়েকখণ্ড রুটি নিয়ে বৃদ্ধকে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াল।

সম্রাট ততক্ষণে উলটোদিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করেছেন। ✠